

জাতীয়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর আজ: পথে ৭৯%, হাসপাতালে ২১% মৃত্যু

প্রতিবেদক: ঢাকা প্রোব ডেস্ক

প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



রোগীর সঙ্গে কে আছেন? জরুরি বিভাগের চিকিৎসকের এমন জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেননি কামাল হাওলাদার। কারণ কয়েক মিনিট আগেও তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল, মাথায় গুলিবিদ্ধ ছেলে সিফাতকে নিশ্চয় বাঁচানো যাবে।

মিরপুরের আল-হেলাল স্পেশালাইজড হাসপাতাল থেকে ছুটে এসেছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, সিফাত আর নেই। হাসপাতালের করিডরেই তীব্র কান্নার যন্ত্রণায় নিভে যায় সন্তান নিয়ে একজন বাবার শেষ আশাটুকু।

এটা শুধু একজন সিফাতকে হারানোর বেদনাবিধুর গল্প নয়।

২৪-এর রক্তাক্ত জুলাইয়ের দিনগুলোয় সিফাতের বাবার মতো অসংখ্য বাবা-মা, ভাই-বোন ও স্বজনকে হাসপাতালের করিডোরে দাঁড়িয়ে গুনতে হয়েছিল সেই নির্মম বাক্য—অনেক আগেই মারা গেছেন। জীবন রক্ষায় যে হাসপাতাল মানুষের শেষ ভরসার স্থল, জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত দিনগুলোয় সেই হাসপাতাল অগণন মানুষের জন্য হয়ে উঠেছিল চিকিৎসা নয়, মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক নিবন্ধনের

স্থান।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত দিনগুলোয় দেশের সরকারি হাসপাতালের ৮৩১ জন জুলাই শহীদের নিবন্ধন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গুরুতর আহত অবস্থায় ৬৫৫ জনকে (৭৮.৮ শতাংশ) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা গেছেন। আর ১৭৬ জন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন শহীদের মধ্যে চারজন প্রাণ হারিয়েছেন চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানোর আগে। পুরো দেশের সরকারি হাসপাতাল থেকে তথ্য নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। তবে সরকারি গেজেট অনুযায়ী জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ৮৪৩ জন শহীদ এবং ১৪ হাজার ৩৭০ জন আহত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, অধিকাংশ শহীদের মাথা, গলা, বুক কিংবা পেটে গুলির আঘাত ছিল। অনেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, কেউ বা মারাত্মক অঙ্গহানি, আবার কেউ আঙুনে দক্ষ হয়ে মারা গেছেন।

জরুরি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুলিবিদ্ধ রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম এক ঘণ্টা ‘গোল্ডেন আওয়ার’ অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ, শ্বাসনালি সচল রাখা, দ্রুত ট্রমা সেন্টারে স্থানান্তর এবং জরুরি অস্ত্রোপচার শুরু করা গেলে অনেক প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু জুলাইয়ের রক্তাক্ত দিনগুলোয় অসংখ্য আহত মানুষ সেই সুযোগ পাননি। গুরুতর আহত অবস্থায় কেউ দীর্ঘ সময় রাস্তায় পড়ে ছিলেন, কেউ পাননি নিরাপদ পরিবহন, আবার কেউ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে প্রাণ হারিয়েছেন।

মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা ৬৫৫ জন শহীদের মধ্যে ৩৩৮ জনের মৃত্যুর তারিখ নথিভুক্ত আছে। বাকি ৩১৭ জনের মৃত্যুর তারিখের ঘর ফাঁকা। ফলে তাঁদের ঠিক কখন মৃত্যু হয়েছে, তার সঠিক সরকারি তথ্য নেই।

অবশ্য হাসপাতালগুলোয় যে-সব তথ্য রয়েছে, সেগুলো জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মৃত্যুর ভয়াবহতার সাক্ষ্য বহন করছে। ২৪-এর ৫ আগস্ট এক দিনেই ১৪৩ জন শহীদের মরদেহ হাসপাতালে আনা হয়। এর আগে-পরে ১৯ জুলাই ৯১ জন, ৪ আগস্ট ৪২ জন, ২০ জুলাই ৩৩ জন এবং ১৮ জুলাই ২৯ জনের মরদেহ আনা হয়। ৫ আগস্টের পরও অন্তত ৩৫ জন শহীদের মরদেহ হাসপাতালে পৌঁছায়। এর মধ্যে ৬ আগস্ট ২১ জন। হাসপাতাল সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, এঁদের অনেককে রাস্তা কিংবা বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল।

ঢাকা মেডিক্যাল যেন রণক্ষেত্র: ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসক ডা. আবরার হামিম বলেন, ‘১৯ জুলাই রাতে হাসপাতাল লাশে ভরে গিয়েছিল। এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে যেতে লাশ ডিঙিয়ে যেতে হয়েছে। বিকেল থেকে একের পর এক রক্তাক্ত মরদেহ আসছিল। সারা রাত অপারেশন চলেছে।’

ঢাকা মেডিক্যালে মর্গের দায়িত্বে থাকা ওয়ার্ড মাস্টার আরিফ বলেন, ‘আমাদের মর্গে আট-দশটি মরদেহ রাখার জায়গা ছিল। কিন্তু একজনের জায়গায় দুই-তিনজনের মরদেহ রাখতে হয়েছে। পরে মেঝে, বারান্দা, এমনকি মর্গের সামনের গলিতেও মরদেহ রাখতে হয়েছে। পুলিশ না থাকায় সুরতহাল ছাড়াই অনেকের মরদেহ স্বজনরা নিয়ে গেছেন।’

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মাথা, গলা ও বুক গুলিবিদ্ধ তরুণদের সামলানো। কারফিউর কারণে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সংকট ছিল। তবু চিকিৎসক ও নার্সরা পায়ে হেঁটে কিংবা রিকশায় হাসপাতালে এসে দিন-রাত জরুরি অস্ত্রোপচার করেছেন। আর ওই সময় পরিচয়হীন লাশের সারি ছিল সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট।’

চিকিৎসকরা যা বলছেন: জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. জাকিয়া সুলতানা নীলা বলেন, ‘১৮ থেকে ২০ জুলাই হাসপাতাল কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। একের পর এক গুরুতর আহত রোগী আসছিলেন, ১০টি অপারেশন থিয়েটারে বিরামহীন অস্ত্রোপচার চলেছে। চিকিৎসকদের রাজনৈতিক চাপ, নজরদারি ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়েছে। অনেক আহত ব্যক্তি গ্রেপ্তারের ভয়ে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করেছেন। তবু চিকিৎসকরা এটিকে শুধু পেশা নয়, মানবিক ও জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখেছেন।’

জাতীয় নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. মাহফুজুর রহমান বলেন, “আহতদের পুলিশি হয়রানি থেকে বাঁচাতে অনেক সময় হাসপাতালের নথিতে ‘গুলিবিদ্ধ’-এর পরিবর্তে ‘সড়ক দুর্ঘটনা’ লেখা হয়েছে। আর শেষদিকে গুলি সরাসরি বুক ও মাথা লক্ষ্য করে করা হচ্ছিল। ওই সময় রোগীর পরিচয় নয়, জীবন বাঁচানোই ছিল সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।”

একই হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. হুমায়ুন কবির হিমু বলেন, “সংকটের দিনগুলোয় অধিকাংশ চিকিৎসক রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে থেকে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কোথাও কোথাও বাধা ছিল, কিন্তু চিকিৎসা থামেনি। রাজনীতি যার যার, চিকিৎসা সবার, এই নীতিই আমাদের পথ দেখিয়েছে।”

হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই প্রাণ শেষ: ২০ জুলাই মিরপুর-১০ এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন সিফাত। বাবা কামাল হাওলাদার প্রথমে তাঁকে সেখানকার আল-হেলাল স্পেশালাইজড হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর সেখান থেকে দ্রুত শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অর্থাৎ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর জীবন নিভে গেছে। বাবা কামাল হাওলাদারের ভাষায়, “ছেলেকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টাটুকুও সফল হয়নি।”

১৯ জুলাই মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকায় আন্দোলনের সময় একটি গুলি ইমনের কানের ওপর দিয়ে ঢুকে চোয়াল ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সহযোগীরা দ্রুত তাঁকে ধানমণ্ডি ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসা শুরুর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে গিয়ে মা জোহরা বেগমকে দেখতে হয় ছেলের নিখর দেহ।

রামপুরায় বেটার লাইফ হাসপাতালের সামনে আকিজ কোম্পানির কর্মী রমজানের খাদ্যনালি ভেদ করে দুটি গুলি। হাসপাতালে অক্সিজেন দিয়ে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় বাড়ি নেওয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বাবার হাতে ফিরে আসে ছেলের নিখর মরদেহ।

৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী এলাকায় আন্দোলনের সময় পোশাকশ্রমিক পারভেজের হাতে ও বুকে গুলি লাগে। তাঁকে প্রথমে মুগদা হাসপাতাল, পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পরিবারের সদস্যরা সারা দিন খুঁজে শেষে ঢাকা মেডিক্যালের মর্গে তাঁর মরদেহ শনাক্ত করেন। ভাগিনা ইয়াসিন ইসলাম বলেন, “মৃত্যুর পর সরকারি নথিতে মামার নাম ভুল লেখা হয়েছিল।”

১৮ জুলাই গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন ৩৭ বছর বয়সী উদ্যোক্তা সোহেল রানা। ঘটনার পর তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরে জানা যায়, তাঁকে রায়ের বাজারের গণকবরে দাফন করা হয়েছে। ভাই জুয়েল হোসেন দীর্ঘ ১৪ মাস প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে, ভিডিও ফুটেজ ও মরদেহের ছবি মিলিয়ে তাঁর কবর শনাক্ত করেন। কিন্তু শেষবারের মতো ভাইয়ের মুখ দেখার সুযোগ আর পাননি। তাঁর ভাষায়, “কবর পেয়েছি, কিন্তু ভাইকে আর পাইলাম না।”

এ বিভাগের আরও খবর



গাজীপুরে গার্মেন্টসে আগুন: অটিকেপড়া ৬৯ জনকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার
গাজীপুরের ভেণির চালা এলাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় লাগা আগুন কারখানার ভেতরে অটিকেপড়া ৬৯ জনকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। আ...



হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া ভারতের বিকল্প ছিল না: ভারতীয় হাইকমিশনার
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া ভারতের হাতে তেমন কোনো বিকল্প ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার...



কঠোর নিরাপত্তায় রূপপুরে পৌঁছাল প্রথম ইউরেনিয়ামের চালান
কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পৌঁছেছে ইউরেনিয়ামবাহী গাড়িবহর। আজ শনিবার (৩ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গাড়িবহর...



চট্টগ্রাম বন্দরে ১৫০ টন বিপজ্জনক কেমিক্যাল ধ্বংস শুরু
চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কনটেইনার জট কমাতে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা বিপজ্জনক কেমিক্যাল ধ্বংসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব কেমিক্যা...

